উপসর্গ

পুরীর সমুদ্রের ধারে ডা. ভদ্রের সঙ্গে দেখা। তিনি ও আমিপাশাপাশি বসেছিলাম ক'দিন বালির ওপরে। কিন্তু আলাপহল সামান্য সূত্রে—একদিন আম কিনতে গিয়ে বাজারে।টাকায় দিশি আম বিক্রি হচ্ছিল আটাশটা, আমি বলছিলামপঁয়ত্রিশটা। এই নিয়ে আমওয়ালার সঙ্গে তর্ক বেধে গেল।ডা.ভদ্র এসে তর্কের মীমাংসা করিয়ে দিয়ে এক টাকায়বত্রিশটা আমের পথ খোলসা করে দিলেন; সুতরাংভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ না হয়ে পারল না।

ডা. ভদ্র দেখলুম বেশ ঈশ্বরভক্ত ও ধার্মিক লোক। আমাকে পেলেই ঈশ্বরের কথা বলতে আরম্ভ করেন। পুরীতেযত মঠ মন্দির ছিল, আমাকে সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালেনপ্রায় সপ্তাহ খানেক ধরে। বলেন : ওই আমার বাতিক—

একদিন আমাকে একটি গল্প বললেন সমুদ্রের বালিরওপর বসে।

ভদ্রলোকের নাম হারাধন ভদ্র। নিবাস হুগলী জেলারকি গ্রামে। সেখানেই ডাক্তারি করেন, পশার মন্দ নয়। বাড়িরঅবস্থা বেশ ভালো, অনেক ধান হয় বছরে। গরু বাছুর একগোয়াল। ভালো ভাবেই খাওয়াপরা চলে যায় দেশে।

তাঁর এক বাতিক পরের উপকার করা। নিজের বৃহৎ পরিবার, চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, দুটি বেকার ছোটভাই—তা সত্ত্বেও তিনি যখন যার দুঃখের কথা শোনেন, পকেটের পয়সা বের না করে পারেন না। পকেট খালি করেদিয়ে তবে তাঁর তৃপ্তি। কত গরিব কুমারী মেয়ের পাত্রজোগাড় করে দিয়েছেন নিজে অর্থ ব্যয় করে, কত দুঃস্থলোককে সাহায্য করেছেন।

এসব পরোপকারের গল্প তিনি আমাকে করেছেন। বেশসরল লোক।

সমুদ্র-ধারের ঝাউবনের মধ্যে একটি মঠ আছে। শান্ত, জনবিরল মঠটি; কি একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের। কিন্তুসম্প্রদায়ের হাতে বোধ হয় তেমন টাকাকড়ি নেই, বেশিলোকজন থাকে না। এইবার থেকে তাঁর নিজের কথাতেইবলি।

বড় ভালো লাগত মঠটি। বিকেল বেলা ঝাউবনেরমধ্যে দিয়ে হু হু করে সমুদ্রের হাওয়া আসত। হাওয়ার সঙ্গে মিশে আছে লবণাক্ত সমুদ্রের গন্ধ। বেশ ছায়া পড়ত মঠেরআঙিনায়, মঠের বাগানে যুঁই, বেল, কৃষ্ণকলি ফুটত।সাধারণত আমি বিকেলের দিকেই সেখানে যেতাম। দু'তিনটি বৈষ্ণব সাধু তখন বাসন-কোশন মাজত, ঘররোয়াক ধুত, মঠের অন্যান্য কাজকর্ম করত। আমাকে একটাকাঁসার ঘটিতে চা নিয়ে এসে দিত, ফলমূল বাতাসা দিত।বেশ কাটত সন্ধেবেলাটা। প্রায়ই যাই সেখানে।

এদের মঠের একটা ছোট্ট ঘরে একদিন একটি শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি দেখি। রাধা নেই, শুধু কৃষ্ণমূর্তি কালো পাথরের। এমন সুন্দর মুখশ্রী, এমন শান্ত চোখ দুটি, অনেক কৃষ্ণ মূর্তি দেখেছি, কিন্তু এ মূর্তিটি যেন সবচেয়ে পৃথক। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম মূর্তিটা। কেমন যে ভালো লাগল। সেই থেকে রোজ একবার করে যেতাম মূর্তিটা দেখতে।তেমন করে পুজোআচ্চা হয়নি বিগ্রহটির। এক এক দিনএকরাশ বেল ফুল তুলে নিয়ে সাজিয়ে দিতাম বেদিতে।টাটকা-তোলা বেল ফুলের সুগন্ধ ভুর ভুর করত মন্দিরে।

রোজ দেখে দেখে মনে হল এই কৃষ্ণ ঠাকুরটি এমনচমৎকার দেখতে, কেমন সুন্দর বালকের মতো অভিমান স্ফুরিত ওষ্ঠাধর, শান্ত সুকুমার মুখমণ্ডল, ঈষৎ বঙ্কিমদৃষ্টিভঙ্গি—অথচ পুরী শহরের বহু মঠ মন্দিরের বিগ্রহেরমতো ইনি বহুজন-পূজিত, বহুজন-দৃষ্ট বা বহুজন-কাম্য নন—নিতান্ত অবহেলিত, এবং উপেক্ষিত। কেউ এঁকে জানে না, এখানে কেউ আসেও না। মঠের অন্নদাস সেবকেরা হেলায় শ্রদ্ধায় দুটো ফুল ফেলে দিতে হয় তাইদেয়। রোজ রোজ দেখে কেমন একটা মায়া জন্মালো আমারএই বেচারি বিগ্রহটির ওপর। ওই জন্যেই নিজের হাতেবেল ফুল তুলে নিয়ে গিয়ে বেদি সাজিয়ে দিতাম।

পুরী থেকে চলে এলাম মাসখানেক পরে।

কর্মস্থলে ফিরে এসেও সদা-সর্বদা সেই বিগ্রহটিরমুখশ্রী আমার মন জুড়ে বসে রইল।

কেমন একটা মায়া, যেন আপনার কোনো লোককে অসহায় ও অনাদৃত অবস্থায় ফেলে এসেছি কতদূরে। এমন মনের ভাব আমার কখনো হয় না, এর আগে হয়নি কোনোকারণে। নিজের মনের ভাবে নিজেই বিস্মিত হই। আবারছুটে গিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয় একবারটি, কিন্তু হুগলী জেলার একটি অখ্যাত পল্লীগ্রাম থেকে পুরী অনেক দূর, পয়সার সেস্বচ্ছলতার অভাব, যার বলে বছরে দু'বার করে পুরী যাওয়াচলে। এই ব্যাপারের বছর খানেক পরে আবার চৈত্র বৈশাখমাস এল।

মন অমনি বিষম চঞ্চল হয়ে উঠল—দূরের এক নীলসমুদ্র, ঝাউবন ও পোলাং গাছের ছায়াবিরল কুঞ্জের জন্যে। সেই সমুদ্র-সৈকত, সেই জ্যোৎস্না, সেই প্রাচীন মন্দিরেরসারি, পুরোনো দরজার দুদিকে স্পর্ধিতভঙ্গি ঝম্প সিংহের দল—সর্বোপরি সেই ক্ষুদ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মঠটিতে অনাদৃত সেই বালবিগ্রহ মূর্তি—এদের আকর্ষণ প্রবল হয়ে উঠল মনের মধ্যে।

অমনি কিছু টাকা জোগাড় করে পুরী এসে পড়লাম।

মালতীপাতপুর স্টেশন যখন ছাড়ল, তখন আমার মনউড়ে চলেছে সেই বৈষ্ণব মঠের বিগ্রহের কাছে। কতক্ষণে পুরী স্টেশনে ট্রেন আসবে ?

পুরীতে পদার্পণ করেই রিক্সা নিয়ে ছুটলাম ধর্মশালার দিকে। বেলা তখনো সামান্য আছে। জিনিসপত্র ধর্মশালারঘরে রেখে একটা দোকানে চা খেয়ে নিলাম। তারপরেইযেন মঠে গিয়ে হাজির। সত্যি, একটুও বাড়িয়ে বলচিনে, কী আনন্দ যে হল ওকে দেখে।

ও-ও যেন আমাকে দেখে অত্যন্ত খুশির ভঙ্গিতেআমার দিকে চেয়ে আছে। যেন ওর স্ফুরিত অধরেঅভিমানের প্রকট চিহ্ন, দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন অভিমান; যেন ওবলতে চাইছে—এতদিন বুঝি আসতে নেই ?

আসব কি করে ?টাকা ছিল ?তুমি বুঝি জানোনা নাআমার টাকা ছিল কিনা ?

বেশ বাবা।

কত রাত হয়েচে খেয়াল নেই, মঠের সেবাইত চাকরএসে জানালে মঠের দোর বন্ধ করার সময় হয়েছে।

সেবার দিনচারেক পুরীতে ছিলাম।

আবার সেই ফুল তোলা, আবার সেই বেদি সাজানো। কোনদিন কামাই যেত না। ভালোবাসার বৃদ্ধি, এমনতরো বৃদ্ধি যে পুরী ছেড়ে যাবার সময় দস্তুরমতো কষ্ট হল সেবার।

যাহোক, বাড়ি তো চলে এলাম। হুগলী জেলারআরামবাগ সাবডিবিশনে আমার বাড়ি, রেলস্টেশন থেকে অনেক দূরে। যেমন মশা, তেমনি ম্যালেরিয়া। এত রোগীবেড়ে গেল সেবার যে বাড়িতে নাওয়া-খাওয়ার সময় পাই না, দু'টাকা আয়ও হতে লাগলো।

শ্রাবণ মাসের দিন। সারা দুপুর মুষলধারে বৃষ্টিহয়েছে। আমি গরুর গাড়ি করে বাড়ি ফিরছি তিন মাইল দূরের একটা গ্রাম থেকে। কেদেটির খাল জলে টইটুম্বুর হয়েফুলে ফেঁপে উঠেচে। গাড়োয়ান বল্লে, বাবু, খাল পার হব ?জল বড্ড বেড়েচে—

আমিবল্লাম—কিছু হবে না, চলো। কতটুকু জলবেড়েচে আর—

যাবার সময় এই খালের জলে নেমে গাড়ি পার হয়েচে সুতরাং আমার ভয় কিছুই ছিল না। কিন্তু জলে নেমে ঠিক যখন খালের মাঝখানে আমরা এসেচি, তখন হঠাৎগাড়োয়ান চেঁচিয়ে বলে উঠলো—জলের তোড় বড্ডবেশি—ছইয়ের দড়ি খুলে দ্যাও, তাড়াতাড়ি দড়ি খোলো—ও ডাক্তারবাবু—শিগগির—

কি হচ্চে বা কি ঘটচে, ভালো করে বোঝবার আগেই ছইসুদ্ধ গাড়ি উল্টে গেল জলের তলায়। আমি সাঁতার জানি বটে কিন্তু উপুড় হওয়া ছইয়ের মধ্যে এমন করে হাত-পাআটকে গেল, মাথা ঠেকলো ছইয়ের গায়ে যে হুড় হুড় করেজল ঢুকতে লাগলো ওর ভেতরে। ডুবে মরে যেতেইবসেচি, ভেবে চিন্তে হাত-পা ছেড়ে দিলাম, ঠিক সেইসময়ে সত্য কথা

বলচি মশাই—কারো মুখ মনে এলনা—চোখের সামনে ভেসে উঠলো বহুদূর পুরীর সেইশ্রীকৃষ্ণ মূর্তি—এমন স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠলো, সেই চোখ, সেই অভিমান-স্ফুরিত ওষ্ঠাধর, সেই মুখ। তারপর কি ঘটলো আমি জানি না, যখন জ্ঞান হল তখন দেখি আমি এক গাছের তলায় শুয়ে। আমার চারিপাশে দু'তিনটি লোক; আমার বুকে ওরা সর্ষের তেল মালিশ করচে।

একটি ছবি তখনই আমার বিদ্যুৎবেগে মনে এল। বল্লেতোমরা বিশ্বাস করবে না। তবুও বলব। বলতে হবে আমায়।

জ্ঞানলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে আমি কিদেখেছিলাম জানো ?

শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি যেন আমার দিকে সাহায্যের ভঙ্গিতে দুইহাত বাড়িয়ে দিয়েচে... সে কথা কিন্তু তখন মনে হয়নি—মনে হল এখন। আমি এক লহমার মধ্যে সে অভয়দানেরছবি দেখেছিলাম।

আমার অসুস্থ মস্তিষ্কের বিকারও হোতে পারেঅবিশ্যি। জোর করে কিছু বলতে চাইচি নে।

বাড়িতে গিয়ে বিছানায় পড়েছিলাম প্রায় দিন সাতআট। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে দেখেছি পুরীর সেই কৃষ্ণঠাকুর আমার শিয়রে বসে। কত ভালোবাসা তার চোখে।

সেরে উঠলাম, কৃষ্ণ ঠাকুর কিন্তু ছাড়ে না আমাকে।তখন তো আমার সুস্থ অবস্থা। কি করে বলি অসুস্থ মস্তিষ্কের কল্পনা !

একদিন আমায় স্পষ্টই বল্লে—তোমাকে ছেড়ে যাবনা। কেউ আমায় ভালোবাসতো না, তুমি ভালোবেসেছিলে।

আমিবল্লাম—না, এখানে তোমার কষ্ট হবে। তুমি চলেযাও তোমার সেই মঠে—

ও বল্লে—সেখানে আপনার লোক কেউ নেই। আমারমুখের দিকে কেউ তাকায় না। বড্ড হেনস্থা করে।

ও বাবা, আবার হুগলী জেলার পাড়াগাঁয়ের মতো মুখের বুলি !

হাসি পেল আমার, হেসেই ফেল্লাম। বল্লাম—তুমিওভালোবাসার কাঙাল ?

কৃষ্ণ ঠাকুর মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

দিন যায়, ডাক্তারি প্র্যাকটিস করি। প্র্যাকটিস খুবজেঁকে উঠেছে আজকাল, এত টাকা জীবনে কখনোরোজগার করিনি, পৈতৃক আমলের মাটির দোতলা ঘর ভেঙে ইটের দোতলা বাড়ি করব ভাবচি। একটি মেয়েরবিয়ের কথাবার্তা চলচে ভালো ঘরেই। বিষয়ে খুব ডুবেআছি।

হঠাৎ সেদিন রাত্রে কৃষ্ণ ঠাকুরটি এসে হাজির ঘুমেরঘোরে।

বল্লাম—কি খবর ?

ও হেসে বল্লে—ভুলে গেলে ?

—না।তবে—

—একবারও মনে করো না।

—তা বলতে পারো বটে।

—আমি কিন্তু সেখানে আর থাকতে পারচি নে।

—ও সব বাজে কথা।

—আমার সেখানে ভালো লাগছে না, তুমি সেখানেনেই।

—আমি কি করে থাকব, আমার সংসার নেই ?তোমারকাছে বসে থাকলে আমার চলবে ?

ব্যস, এই পর্যন্ত। আর কৃষ্ণ ঠাকুরকে দেখতে পেলাম না। ঠাকুর সোজা অন্তর্হিত।

এর পরে অনেক দিন কেটে গেল। আমার নতুনদোতলা বাড়ি উঠেচে, মেয়ের বিয়ে ভালো করে হয়েগিয়েচে। প্র্যাকটিস বেশ জমাট, দুটো নতুন ডাক্তারি আখড়াখুলেচি আমার গ্রাম থেকে দূরে, সাইকেলে যাতায়াত করি।

একদিন খুব বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে, আবার সেই বর্ষাকাল, সন্ধের পর আমার নতুন সেন্টার থেকে রুগী দেখে ফিরচি।হঠাৎ এল ভীষণ বৃষ্টি। কাছে ছাতি নেই—বর্ষাতি নেই—পাছে ভিজে যাই এজন্য আশ্রয় খুঁজবার জন্যে এদিক ওদিকতাকাতে গিয়ে আমি নবি নগরের পুরনো থানাঘরের পাশেইএসে পড়েচি। একটা গাছতলায় সাইকেল রেখে ছুটে গিয়েথানার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ধোঁয়ায় আর সন্ধ্যার অন্ধকারে বাইরের জগৎ লুপ্ত হয়ে গেল যেন।

নবি নগরের থানাঘর সম্বন্ধে কিছু না বল্লে ব্যাপারটাঠিক বোঝানো যাবে না। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে এখানেএকটা ফাঁড়িঘর ছিল, কেন উঠে গেল তা বলতে পারব না।এখন কেবল মেজেটা আছে আর দাঁড়িয়ে আছে তিনটিদেওয়াল তিনদিকে। সেই তিন দেওয়ালের ওপর ভাঙাছাদের যতটুকু দাঁড়িয়ে আছে, তারই তলায় কোনোরকমেদেওয়াল ঘেঁষে বৃষ্টির ছাট থেকে বাঁচবার দুরাশায় খাড়ারইলাম। ভীষণ অন্ধকার চারিদিকে।

হঠাৎ একটা ফোঁস ফোঁস শব্দে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল।

আমার মনে পড়ে গেল পঁচিশ বছরের পুরনো ভাঙামেঝেতে দাঁড়িয়ে রয়েচি এবং দেওয়ালে, মেঝেতে যেখানেঅসংখ্য ফাটল ও গর্ত।

খুব কাছেই ফোঁস ফোঁস করে উঠল আবার। আমিআড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কোথায় কোনদিকে, কি সাপটা ?এই অন্ধকারে কিছু কি ঠাওর হয় ?

এমন সময় সাপটাকে আমি দেখতে পেলাম। যেদোরটা দিয়ে ঢুকেচি, সেই দোরটাতেই প্রকাণ্ড একটাকালীগোখুরা ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিক দিয়ে পালাবার উপায় নেই, কারণ ভাঙা দেওয়ালের ইট সুরকিএক দিকের পথ বন্ধ করেচে—অন্য তিনদিকের দেওয়ালতো দাঁড়িয়েই আছে।

সাপটা আমায় লক্ষ করেই ফোঁস ফোঁস করচে। এখুনি ছোবল মারলো বলে। বেঘোরে প্রাণ হারালুম সন্ধ্যারঅন্ধকারে। কোনো উপায় নেই। একখানা ইট তুলে মারবারযে চেষ্টা করব, সে চেষ্টা করতে সাহস পাইনে—যেই একটুনড়ব আর অমনি ও ছোবল মারবে।

আমার তখনি মনে পড়লো সেই কৃষ্ণ ঠাকুরের কথা।

আর দেখা হবে না। বিদায় !

সাপটা তখনো দুলচে।....

আমি একদৃষ্টে ওটার দিকে চেয়ে আছি, অন্যদিকেচোখ ফেরাতে পারচি নে। ওর চোখের ক্রুর দৃষ্টি আমাকেসম্মোহিত করেচে।

পরক্ষণেই সাপটা ফণা নিচু করে অন্ধকারে কোথায়মিলিয়ে গেল।

বাড়ি এসে সেই রাত্রে আবার কৃষ্ণ ঠাকুরের দেখাপেলাম গভীর ঘুমের মধ্যে।

চোখ নাচিয়ে দুষ্টুমির সুরে বল্লে—কেমন ?

—কি, কেমন ?

—সাপ ?আজ সন্ধেবেলা ?

—ওঃ, বাপ রে, কি বিপদেই পড়েছিলাম। মারা যেতামআর একটু হলে আর কি—

—তাই কি তোমাকে মারা যেতে দিই ?ও সব আমারখেলা। দেখলাম আমার কথা তোমার মনে আসে কি নাবিপদের সময়ে। দু'বার বিপদে ফেলে দেখেচি।

—কি দেখলে ?

তা বলব না। মরোনি তো আর ?চলো, পুরীতে আমি একলা আছি। ভালোলাগচে না।

তারপর থেকেই মশাই, প্রায়ই পুরী এসে দু'তিন মাসকরে থেকে যাই।

এবার আমি অনেকক্ষণ পরে কথাবল্লাম। বল্লাম—সেই ঠাকুরটি ?

সেই রকমই। পাগল, মশাই পাগল। আমাকে কোথাওযেতে দেবে না। ও আবার কি, আমার কাজকর্ম নেই মশাই, আপনারাই বলুন তো ?